পাওয়া না পাওয়ার রঙ - নব্বই দশকের বাংলা গান

রংগন চত্রবর্তী

হাতের মুঠোয় গান –

অনেক দিন আগে কলকাতা শহর যখন গড়ে উঠছিল, তখন তৈরি হয়েছিল নানা ধরনের কলকাতার গান। অষ্টাদশ শতকে নানা ধরনের মানুষ যখন জীবিকা ও জীবনের সন্ধানে এই নতুন শহরে আসা শুরু করেন তখন তাঁরা সঙ্গে আনেন গ্রাম্য গানের এক বিশাল বিচিত্র সম্ভার। নতুন শহরের নতুন জীবনের অভিজ্ঞতায় সেই গান বদলায়। তার পরিবেশন, পরিবেশ সবই বদলে যায়। (১) সেই সময় আবার জাতীয়তাবাদের উত্থানের সময়। তখন ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী চিন্তার এক প্রধান কেন্দ্র ছিল কলকাতা শহর। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটা মূল উদ্দেশ্য ছিল এমন এক সাংস্কৃতিক ভিত্তি তৈরি করা যার ওপরে পা রেখে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র যন্ত্রকে উত্তর - উপনিবেশ জাতি - রাষ্ট্রে পরিণত করা যাবে। এই আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, তার উচ্চবিত্ত, উচ্চশিক্ষা, উচ্চশ্রেণী, পিতৃতন্ত্র ভিত্তিক চিত্তবোধের চোখে কলকাতার গান ছিল অশ্লীল, জাতি গঠনের অনুপযুক্ত। (২) এর ফলে সেই গানের ওপর আঘাত নেমে আসে। কলকাতার গানের বিরোধিতায় জাতীয়তাবাদীরা ইংরেজ শাসকের সঙ্গেও হাত মেলায়। সেই আক্রমণের মোকাবিলা করা কলকাতায় গানের পৃষ্ঠপোষকদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই গানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মূলত দুই শ্রেণীর মানুষ। কিছু ধনী, জমিদার ও ব্যবসায়ী যাঁরা উচ্চবিত্ত হয়েও উচ্চরুচি অর্জন করতে পারেন নি। এবং সংখ্যায় অনেক বেশি নিম্নবিত্তের মানুষ। যাঁদের নিম্নরুচির ওপরই ছিল স্বাভাবিক অধিকার। প্রথম শ্রেণী যেন লজ্জায় পড়েই গুটিয়ে যান। কিছু গোপন পৃষ্ঠপোষকতা চলতে থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর পক্ষে জীবিকা অর্জনের রাস্তাই বন্ধ হয়ে যায়। ফলে গায়ক গায়িকারা অন্যান্য জীবিকায় প্রবেশে সচেষ্ট হন। গায়িকাদের ক্ষেত্রে কণ্ঠ থেকে দেহ ব্যবসায় সরে আসা ছাড়া গতি থাকে না।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে গ্রামোফোন, রেডিও এবং চলচ্চিত্র বাংলা গানের মূল মাধ্যম হয়ে ওঠে। গ্রামাঞ্চলে গানের আসরের জনপ্রিয়তা অব্যাহত থাকলেও, কলকাতা শহরে গান শুনতে হলে কিছুটা গ্রামোফোন এবং অনেকটাই রেডিও ছাড়া উপায় ছিল না। এর ফলে কয়েকটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। শরীরের গান অশরীরী হয়ে ওঠে। মানুষ থেকে মানুষের নয়, গানের লেনদেন এবার ঘটে যন্ত্রের মধ্য দিয়ে। গানের ব্যবসা শিল্পের রূপ নেয়। শ্রম বিভাজন দেখা যায়। গীতিকার, সুরকার, গায়ক, যন্ত্রী--নানান ভূমিকায় পেশাদারদের আমরা দেখতে পাই। গ্রামোফেন এবং রেডিওতে গানের রুচি তৈরিরও একটা চেষ্টা চলে। গ্রাম্য কথা উচ্চারণ ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে বর্জনীয় হয়। মূল শ্রোতা যেহেতু শহুরে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণী, তাই তাঁদের উপযুক্ত গান তৈরি করার প্রয়াস দেখা যায়।
মিশ্র অর্থনীতির মতো স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে এক মিশ্র মিডিয়া নীতি আমরা লক্ষ করতে পারি। এই নীতিতে রেডিও মূলত সরকারি নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং চলচ্চিত্র ও সংবাদপত্র থাকে বেসরকারি সংস্থার অধীনে। সত্তর দশকে ভারতবর্ষে সরকার নিয়ন্ত্রিত টেলিভিশন ছড়িয়ে পড়ে। সরকা রি ও বেসরকারি সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণে একটা জটিল সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ইদানীং হিন্দি চলচ্চিত্র নিয়ে যে বেশ কিছু গবেষণামূলক কাজ হচ্ছে তার দৌলতে আমরা দেখতে পাই যে হিন্দি ছবিতে সরকারি প্রচারের বাইরে ভারতীয়ত্বের কিছু অন্য ছবিও ফুটে উঠছিল। পক্ষে /বিপক্ষে বা সদর্থক /বিরোধী জাতীয় সহজ লেবেল না এঁটে গোষ্ঠী বা সমাজের রূপকল্প কীভাবে সংস্কৃতিকে বারবার নানা রূপ দেয় তার আলোচনা খুবই জরুরি।
বাংলা গানের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রসঙ্গ আনলাম এই কারণেই যে বাংলা গানের ক্ষেত্রে কিন্তু সরকারি / বেসরকারি গানের প্রচারে মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব বা পার্থক্য প্রায় চোখে পড়ে না। গ্রামোফোন কোম্পানি বা বাংলা ছবির গান এবং রেডিওর গান - এর মধ্যে সাংস্কৃতিক সামঞ্জস্যটাই লক্ষণীয়। বোধহয় এ কথা বলা যায় যে গোড়াতেই যাদেরবাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল রেডিও - ফিল্ম - গ্রামোফোনের জগতে তারা আর প্রবেশ করে নি।

বাংলা গানের রুচিবোধ তৈরি করার ক্ষেত্রে রেডিও একটা প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। গ্রামোফোনের ব্যবহার সেই তুলনায় ছিল নিতান্তই সীমাবদ্ধ। রেডিও স্বাভাবিক ভাবেই গান শোনার এক বিশেষ অভ্যাস তৈরি করে। গান তৈরি হয় ওপরে -- শ্রোতা শোনে নিচ থেকে। গানের নিয়ন্ত্রণ তার হাতে সেই অর্থে থাকে না। অভ্যাসটা অনেক ক্ষেত্রেই হয় অভিভূত - আপ্লুত ভক্তের, দুহাতে অঞ্জলি করে তুলে নেওয়ার। যে ভাষায় গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন আমরা দেখি--নিজেরা নাটক করব-- এই স্পর্ধায় যার ভিৎ, যে ভাষায় লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন আমরা দেখি--নিজেরা লিখব--এই আত্মবিশ্বাসে যার জন্ম, সে ভাষায় গানের আন্দোলন কেন হয় নি সে প্রশ্ন করা প্রয়োজন নয় কি?
এ প্রশ্নের উত্তর শুধু অর্থনীতিতে পাওয়া যাবে না বলেই আমার বিশ্বাস। বহু লিটল ম্যাগাজিন সামান্য কয়েক কপি বিক্রি হয়। তাতে লেখা বন্ধ হয় না। বহু গ্রুপ থিয়েটারের নাটক সামান্য কয়েক জন দেখেন। তাতে নাটকবন্ধন হয় না। গানের ক্ষেত্রে এক বিশেষ ইতিহাস গান লেখা - গাওয়াকে এক অসম্ভবের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। সাধ্য দূরস্থান সাধেরও আওতার বাইরে। বিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ সময় ধরে আমরা তাই সন্ধ্যা, লতা, হেমন্ত, কিশোর, মান্নার সক্ষম বা অক্ষম অনুকরণের বাইরে বিশেষ ভেবে উঠতে পারি নি। এই সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়াগুলোর আরও বেশি করে অনুসন্ধান প্রয়োজন। গল্পটা কিন্তু অনেকটাই পাল্টে গেল নববইয়ের দশকে এসে। এর আগেও বাংলা গানে নিজেরা নিজেদের গান গাওয়ার কিছু চেষ্টা আমরা দেখেছি। মহীনের ঘোড়াগুলি, রঞ্জনপ্রসাদ, নগর

ফিলামেলকে আমরা পেয়েছি। আরও সরাসরিভাবে রাজনৈতিক গানের সঙ্গে যুক্ত কিছু গায়কও ছিলেন। কিন্তু বাংলা গানের মূল স্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাঁতার দেওয়ার, হয়তো স্রোতটাকেই কিছুটা বদলে দেওয়ার স্পর্ধা ও শক্তি সুমন চট্টোপাধ্যায়ের আগে কয়েক দশকে আমরা দেখি নি। এ কথা স্বীকার করা প্রয়োজন বোধ হয়। পাশাপাশি ব্যক্তি সুমনের ক্ষমতাকে কোনো অংশে ছোট না করেও নব্বইয়ের দশকের মিডিয়া বিশ্বায়নের পটভূমিকা এবং বাংলা গানের নতুন বিস্তারের সঙ্গে তার সম্পর্ক বিচার করাও অত্যন্ত জরুরি হয়ে ওঠে।

আশির দশকে পৃথিবী জুড়ে অডিও ক্যাসেট টেকনলজিতে একটা বিপ্লব ঘটে। বলা বাহুল্য ভারতবর্ষে তার ঢেউ এসে পৌঁছায়। আমরা দেখি টি-সিরিজ ইত্যাদির উত্থান। এইচ. এম. ভি. বা গ্রামোফোন কোম্পানির একচ্ছত্র আধিপত্য প্রথমে টলে ওঠে ও তারপর ভেঙে যায়। হাজার হাজার নতুন গায়ক গায়িকা ও রেকর্ডিং কোম্পানী গজিয়ে ওঠে। অনেকেই আবার হারিয়ে যায়-- কেউ কেউ টিকেও যায়। এই বিপ্লবে মূল যে ক্ষমতা বদল আমরা দেখি তা হলো আকাশবাণী ও সুরের গান হাতের মুঠোয় এসে যায় টিন এজার ছেলে মেয়েদের চিরকাল সংস্কৃতি জগতে অবহেলা করা হয়েছে। তোমরা আবার গানের কি বোঝ হে-- তফাৎ যাও, বাচ্চা ছেলে ! -- এরকম একটা ধারণা ছিল... টেপ রেকর্ডার আসার পরেই দেখা গেল সংস্কৃতি এসে গেল ওই অল্পবয়সীদের হাতে। ক্যাসেটের দাম নেমে এল ১৮ -২০ টাকায়, পয়সা বাঁচিয়ে ক্যাসেট কেনা মোটেই কঠিন নয় আর। আগে কিন্তু সংস্কৃতিতে ঢোকার জন্য বাবা- মার উপরে, অর্থাৎ পূর্ববর্তী প্রজন্মের উপরেই নির্ভর করতে হত। তাই বদলে গেল হিট - এর ডেফিনেশন। কতজন একটা গানকে ভাল বলল তা নয়, একটা গান কত বিক্রি হল-- সেটাই হিট করার মাপকাঠি। (৩) খুব সংক্ষেপে এবং সহজ ভাবে নচিকেতা কিন্তু কয়েকটা বড় বদলের কথা খুব সঠিকভাবে নির্দেশ করেছেন। বাংলা গানের একটা বড় সময় জুড়ে এক ধরনের সাংস্কৃতিক মূলধন ভিত্তিক রুচিবোধের প্রাধান্য ছিল। অর্থাৎ বাণিজ্যিক সাফল্য ছাড়াও সাংস্কৃতিক প্রভুত্ব করা যেত। বিক্রয় ভিত্তিক বাজার সংস্কৃতিতে সেই হিসাবটাই পাল্টে যেতে বাধ্য। ভালো - মন্দের বিচারে না নেমেও এই প্রক্রিয়াগুলোর গুরুত্ব লক্ষ করা বোধ হয় প্রয়োজন।

বাজারও কিন্তু বদলায় –

সংস্কৃতির আলোচনায় বাজার সম্পর্কে একটা ছুঁৎমার্গিতা রয়েই গেছে, যা ভালো তা বিক্রি হয় না। যা বিক্রি হয় তা ভালো না-- এই ধরনের ধারনা প্রায়ই দেখা যায়। বাজারে যা বিক্রি হয় তাই ভালো এবং বাজারই হলো ভালো জিনিসের একমাত্র মাপকাঠি একথা আমি বলছি না। কিন্তু কী ভালো তাই বিক্রি হয় নি এই ধরনের প্রশ্রয়ের আড়ালে বহু নিম্নমানের, নির্গুন সাংস্কৃতিক প্রয়াসও কি রেহাই পেয়ে যায় না ? বাজার একটা অসাধারণ মুক্তাঞ্চল যেখানে সব কণ্ঠস্বরেরই সমান জায়গা আছে একথা যেমন অবাস্তব, তেমনই বাজারে সফল হওয়া মানেই কোনো সাংস্কৃতিক প্রয়াস বাধ্যতামূলক ভাবে নিম্নরুচির একথা মেনে নেওয়া কঠিন। আসলে এই ধরনের মতামতের পেছনে একটা দীর্ঘ মতবাদের ইতিহাস আছে। সেই মতবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাজারকে অবশ্যম্ভাবী ভাবেই সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিরোধী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখা হয়। এই মতবাদে সাধারণ মানুষের ভূমিকাও সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয় অসহায় শিকার বা হতভাগ্য মননহীন প্রাণী হিসেবে, যারা নিরুপায় ভাবেই তাদের জন্য গণহারে উৎপাদিত নিম্ন মানের সাংস্কৃতিক খাদ্য গিলে খাচ্ছে ।

(৪) এই মতবাদের পেছনে খানিকটা প্রবক্তাদের উচচরুচির, উন্নাসিক ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। সমালোচক যেন এই প্রক্রিয়ার বাইরে। এই ক্ষমতার সম্পর্কের ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে তাঁর মতামত রাখছেন। এই চোখে দেখলে সাংস্কৃতিক লেনদেনে মানুষের অংশগ্রহণে তাদের স্বাধীন মতামত, স্বাধীন সত্তার কোন ভূমিকাকেও স্বীকার করার জায়গা আমাদের জন্য থাকে না। সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সংস্কৃতির ভূমিকাকে বোঝার আগ্রহ যত বাড়ছে, এই ধরনের সরল মতবাদকে গ্রহণ করা ততই কঠিন হয়ে উঠেছে। এই বোধ ক্রমশই দানা বাঁধছে যে মানুষ যে কোনো পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে সংস্কৃতিকে ব্যবহার করে জীবনের মানে তৈরি করে নেবার জন্য। অর্থনৈতিক প্রাধান্য, প্রাতিষ্ঠানিক প্রভুত্ব বিভিন্ন ভাবে সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই করে কিন্তু কখনোই পুরোপুরি বশ করতে পারে না। বিশিষ্ট সংস্কৃতি সমালোচক স্টুয়ার্ট হলের মতে যে কোনো সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ায় প্রেরক যে মানে পাঠায় গ্রাহক তাকে তিন ভাবে গ্রহণ করতে পারে - ১) অনুগত, ২) আংশিক সমঝোতা, ৩) স ম্পূর্ণ বিরোধী। কাজেই প্রক্রিয়াগুলো খুবই জটিল। আমাদের মনকে প্রভাবিত করা যেতে পারে কিন্তু সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা খুব সহজ নয়। (৫) যদি তা যেত তা হলে ইতিহাস বদলাতো না। অন্য ধ্যান ধারণার স্ফুরণ বা বিকাশ হওয়া সম্ভব হত না। অন্য দিকে বাজারও ইতিহাসের টানাপোড়েনের বাইরে অজর, অমর, অক্ষর কোনো প্রতিষ্ঠান নয়। আত্মরক্ষা ও আত্মবৃদ্ধির প্রয়োজনে সেও প্রতিনিয়ত জটিল থেকে জটিলতর পথে বেড়ে চলেছে। এ কথা ঠিক যে বাংলা আধুনিক গানের বিকাশের অধিকাংশ সময় ধরে গ্রামোফোন কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত গায়ক গায়িকার, নিরাপদ গানের ধারার বাইরে অন্য কোনো রকম কণ্ঠকে জায়গা দেয় নি। কোন এক গাঁয়ের বধু বা রানার জাতীয় দু একটি গান, পরবর্তী যুগে ভূপেন হাজারিকার কিছু গানের বিষয়ের কিছু বৈচিত্র্য ছাড়া বাংলা গান নারী-পুরুষ - প্রকৃতি- প্রেম ভিত্তিক এক চেনা রাস্তাতেই মূলত চলেছে। কিন্তু বাজারের বাইরেও এই বিশাল সময় ধরে তেমন ভাবে গানও তৈরি হয় নি। যাও বা হয়েছে বাজারের ছুঁৎমা র্গিতার কারণে তাও রেকর্ডে তেমন ভাবে আসে নি। কিন্তু সেই বাজারই নব্বইয়ের দশকে এসে নতুন গায়কদের গানের মূল পৃষ্ঠপোষককে পরিণত হল। সুমন, নচিকেতা, অঞ্জন, শিলাজিৎ, মৌসুমী থেকে আজকের ভূমি, চন্দ্রবিন্দু, পরশপাথর পর্যন্ত অডিও ক্যাসেটই যে নতুন গানের আত্মপ্রকাশের প্রধান অস্ত্র সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সাফল্যের হিসেবটা সোজা। ক্যাসেট জনপ্রিয়তা দেয়, দু - একজনকে ছাড়া তেমন পয়সা দেয় না। কিন্তু ক্যাসেট হিট হলে অনুষ্ঠান আসে। রোজগারের বেশিরভাগটা সেখান থেকেই আসে।

নতুন গানের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখতে পেলাম যে বাংলা গানের ক্ষেত্রেও বাজার অনেকটা বদলেছে। সাংস্কৃতিক পুলিসের ভূমিকায় সে আর থাকতে রাজি নয়।

ইতিমধ্যে ঠাণ্ডা যুদ্ধ-- উত্তর পৃথিবীতে বামপন্থার ভয়টাও বদলে গেছে। বাজার বুঝেছে যে এক ধরণের প্রতিবাদও পণ্য এখন তাতে ভয়ের কিছু নেই। বরং সেই প্রতিবাদের গায়ক এবং শ্রোতার মধ্যে বাহনের ব্যবসাটা খুবই লাভজনক হতে পারে।

তা হলে কি বাজার বাহিত বলেই এই গানের বিত্রয়মূল্যের বাইরে কোনো মূল্য নেই? সেই সরল রাজনীতির বাঁকে কি আমরা এখনও ঘুরে মরব ? এই লেখকের দুঃখ যে উত্তরটা এখনও বোধ হয় তাই। সরল রাজনীতি থেকে বেরোনোর ঝুঁকি নিতে আমরা অনেকেই রাজি নই। নতুন বাংলা গানের মূল্যায়ন করতে গিয়ে তার বাণিজ্যিক চরিত্র আমাদের বড় বিব্রত করে।

আমাদের শ্রোতার ভূমিকা থেকে সমালোচকের ভূমিকায় যাওয়ার মধ্যে এক নীতিবাদী, অসৎ সত্তা ঢুকে পড়ে।

তার মুখোমুখি না হলে, মনের আয়নায় মুখ না দেখলে সমালোচনা সীমাবদ্ধ থেকে যেতে বাধ্য।

কোনটার কত দাম –

নববই দশকে গানের বাজারে যে সব গায়ক / গায়িকা তাঁদের গান নিয়ে উঠে এসেছিলেন তাঁদের কয়েকজনকে নিয়ে আলোচনা করে আমরা দেখতে পারি হিসেবের খাতা একেবারেই শূণ্য কিনা। না কি মানুষ দাম দিয়ে এইগান কিনেছে তার অন্য ধরনের কোনো দাম আছে বলেই। আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্ব ভরা প্রাণ রবীন্দ্রনাথের গান। আমাদের অত্যন্ত পরিচিত।

গীতবিতানে প্রকৃতি বিভাগের অন্তর্গত এই গানে আমরা বিশ্বজনীন মানবতারই জয়গান শুনতে পাই।

এ গান এমন এক সত্তার যে তার নাড়ীতে, তার রক্ত ধারায় মহাবিশ্বের টান টের পায়, ঘাসে পা ফেলার আনন্দে, বিশ্বভরা প্রাণের ছন্দে তার গান জেগে ওঠে। নববই দশকের গানের একজন অন্যতম প্রধান গায়ক অঞ্জন দত্ত। অঞ্জনেরও একটি পরিচিত গানে শুর শব্দগুলি হল আকাশ ভরা সূর্য তারা যেন রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করেই।

এর আগে রাবীন্দ্রিক পরিমণ্ডলের বাইরেও এইগানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হয়েছে। ঋত্বিক ঘটকের বিখ্যাত ছবি - কোমল গান্ধারে - আমরা দেবব্রতর গলায় এ গান শুনেছি। বামপন্থী আন্তর্জাতিকতাবাদেও এ গান ব্যবহারে অসুবিধে হয় নি। কিন্তু নববইয়ের দশকে এসে এ গান বদলে গেল একেবারে। অঞ্জন লিখলেন

আকাশ ভরা সূর্যতারা
আকাশ মুখী সারি সারি
কালো ধোঁওয়ায় ঢেকে যাওয়া ঠাসাটাসি বাক্স বাড়ি
এখানে থেকেই চলার শুরু এখান থেকেই হামাগুড়ি
এখানটাতেই আমার বাসা, আমার বাড়ি...

বিশ্বজনীন মানবতার আকাশ থেকে আছাড় খেয়ে এক্কেবারে বেনিয়াপুকুরে এসে পড়া। অঞ্জনের গানে আমরা জানি তাঁর নিজের পাড়া বেনিয়াপুকুর বারবার ফিরে আসে। ফিরে আসে রাজু, রানী, ব্যাম্বো, কালো মেম আর যে আলিবাবা বাজারে মুরগি ছাড়ায়।

এই গানেও আমরা সোজা এসে ঢুকি ঠাসাঠাসি বাড়ি আর অলি - গলি পাকস্থলীর জগতে।

বিশ্বায়নের যুগে, বিশ্বায়িত অডিও টেকনোলজি আর বাজারের উৎপাদন এই গানে কিন্তু গানের আমির স্থানাঙ্ক নির্ণয়ে এক নির্মম শহুরে জনপদায়ন ঘটে। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরে দমবন্ধ এই পরিসরে সূর্য - তারার চেয়ে ধোঁয়া আর ক্লেদ অনেক বেশি সত্য। আর এই পরিসর বা অপরিসরে বাস করে একদল মানুষ। তাদের আমরা চিনি। যে অনিন্দিতা আত্মহত্যায় মুক্তি খুঁজেছে, যে চৌধুরীরা উঁচুতলার ফ্ল্যাটের জীবনে সারাক্ষণ ঝগড়ায় বন্দী, যে বৃদ্ধ নন্দীবাবুর ছেলে বয়ে গেছে, তাঁরা কেউ আমাদের অপরিচিত নন।

কিন্তু নববইয়ের দশকে সুমনের দশ ফুট বাই দশ ফুট এঁদের পরিচয় পাওয়ার আগে এঁদের আসল ঠিকানা হয়তো বাংলা নাটকে, গল্পে প্রবন্ধে ছিল, গানে ছিল না। কাস্তে শান দেওয়া কৃষক বা ধর্মঘটী শ্রমিক ছাড়া বাংলা গানে সাধারণ জীবন আমরা কতবার পেয়েছি ? লক্ষ করার প্রয়োজন ধোঁয়া আর ধুলোর এই জগতে কিন্তু একটা রেডিও -ও আছে। কিন্তু রেডিওটার ব্যাটারিটা হঠাৎ করে গেল ক্ষয়ে... খাটের থেকে নামতে মানা, বুকের ব্যথা গেছে সয়ে। এই যে অবক্ষয়ের জগত সেখানে মিডিয়ার গল্পও আর এসে পৌঁছয় না। তাকে গ্রহণ করার জন্য যে এনার্জি লাগে, সেই ব্যাটারিও আর নেই। কিন্তু অঞ্জনের গানে কোনো কাঁদুনিও নেই, কোনো বাড়তি নাটকীয়তাও নেই। এইরকম হয়েছে। অন্য কিছু হওয়ার কথা ছিল কি? গানের সুরে বিদেশী ব্যালাডের ছাপ--টানা সুরের ঢিমে লয় যেন এই আশাহীন বন্দিত্বের রোজনামচার দ্যোতক। এই গানের শক্তির উৎস এই জীবনটাকে মেনে নেওয়ার মধ্যে। আবার অঞ্জনের গান কিন্তু হতাশার, ব্যর্থতার গান নয়, বরং তাঁর গানের চরিত্ররা আশর্চ্য জীবন্ত হয়ে বেঁচে থাকে প্রতি দিনের ছোট ছোট লড়াই-এ। যে লোকটা ট্রেনে লজেন্স বেচে বা যে লোকটা হোটেলে স্যাক্সোফোন বাজায় তারা কোনো বড় রাজনৈতিক অর্থে হয়তো কমরেড নয় কিন্তু যোদ্ধা তো অবশ্যই। অঞ্জনের বহু গানে বড় রাজনীতির সঙ্গে সংযোগহীনতাই এক রাজনীতি হয়ে দাঁড়ায়। যেমন টিভি দেখো না গানাটি। গানটিতে আমরা দেখি কেটি বাচচাকে যাকে তার বাবা মা বাড়িতে রেখে বাইরে বেরিয়েছেন। মা টিভি দেখতে বারন করে গেছেন। তা হলে বাচচাটা কি টিভি দেখবে ? অঞ্জন বলছেন আমি বলি কি একটা ছোট্ট চালাকি করে দেখ না। জানলার বাইরের আকাশটা দেখ, টিভি দেখো না। টিভি দেখা না দেখার, আদেশ পালন / অমান্য করার পরিচিত দ্বন্দ্ব ও যুক্তিকে ছাড়িয়ে যায় এই পরামর্শ --তর্কটা একটা

অন্য মাত্রা পায় যার জন্য বাচ্চার (সমাজের ?) অভিভাবকরাও তৈরি নন। অঞ্জনেরই আরেকটা গান-- রঞ্জনা আমি আর আসবো না। এই গানে আমরা এক মুসলমান স্কুল ছাত্রের দেখা পাই। সে তার প্রেমিকাকে জানায় যে পাড়ায় ঢুকলে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবে বলেছে পাড়ার দাদারা তাই প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে সে আর আসতে পারবে না। এই গানেও আমরা এমন একজন মানুষের দেখা পাই যে প্রচলিত হিসেবের বাইরে

ধর্ম আমার নিজে বেছে নিই নি।
পদবীতে ছিল না যে হাত
মসজিদে যেতে হয় তাই জোর করে যাই বছরে দু-এক বার।
বাংলায় সত্তর পাই আমি এক্সামে ভালো লাগে খেতে ভাত মাছ
গাঁজা সিগারেট আমি কোনোটাই খাইনা পারিনা চড়তে কোন গাছ
চশমাটা খুলে গেলে মুশকিলে পড়ি
দাদা আমি এখনও যে ইশকুলে পড়ি
কব্জির জোরে আমি পারবো না।

এ ছেলে দূরে ঠেলে দেওয়া আদরও নয়, আবার পিঠ চাপড়ে দেওয়ার ব্রাদার ও নয়। আমাদের প্রচলিত স্টিরিও টাইপিং একেবারেই খাটেনা। যেন আমাদের মতোই আর এক জন, ধর্মটা যার প্রাথমিক পরিচয় নয়। যে গানে আমাদের এরকম চরিত্রদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে তার কি কোনো দাম নেই? নচিকেতা নববইয়ের দশকের বোধ হয় জনপ্রিয়তম গায়ক। যতদূর জানি ক্যাসেট বিক্রি বা অনুষ্ঠানের সংখ্যা দুইয়েতেই ইনি অন্যদের থেকে অনেক এগিয়ে ছিলেন। এই নচিকেতার একটি বিখ্যাত গান সারে জাঁহা সে আচ্ছা। বলা বাহুল্য কথাগুলো ইকবালের বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী গান থেকে নেওয়া। নচিকেতার গানের কথাগুলো একবার পড়ে নেওয়া যাক

আমার পরিচয় বেকার যুবক আমি সম্বল একটাই দৈন্য
ডিগ্রির ভাঁড়ারেতে তবু কিছু মাল আছে পকেটের ভাঁড়ারটা শূন্য
যে দিকেই তাকাই না দেখি জন অরণ্য
সে অরণ্যেই দেখি মানুষের আপন্ন
বধূকে পোড়ানো হয় অধর্ম জয়ীহয়
মানুষের রক্তেই দিনলিপি , সই হয়
হাসপাতালের বেডে টিবি রোগীর সাথে খেলা করে শুয়োরের বাচ্চা
তবু রেডিওটা বিটভিটার সাথে সুর ধরে সারে জাহাঁসে আচ্ছা।

এ পৃথিবী বা দেশ ইকবালের গুলিস্তান আর বুলবুলের দেশের থেকে অনেকটাই দূরে। এ গানের মূল সুরে যে অভিযোগের-- কেউ কথা রাখে নি। সরকার ডিগ্রি দিয়েছে, কাজ দেয় নি। বধূ নির্যাতন, সামাজিক অত্যাচার অবিরাম চলছে। কে ানও বিচার নেই। বাংলা গানে এও তো এক নতুন অভিজ্ঞতা। প্রায় টেলিভিশনের মতো এক দৃশ্যায়ন এই গানে আমরা দেখি। মিডিয়া শাসিত পরিমণ্ডল না থাকলে গানে এই দৃশ্যবোধই হয়তো তৈরি হত না। এই দৃশ্যবোধ আবার সরকার নিয়ন্ত্রিত রেডিও ও টেলিভিশনের প্রচারকে মিথ্যা বলে চিহ্নিত করে। হাসপাতালের বেডে টিবি রোগীর সাথে যখন শুয়োরের বাচ্চা খেলা করে তখন সারে জাঁহা সে আচ্ছার জাতীয়তাবাদী স্বপ্ন জাতি রাষ্ট্রেরব্যর্থতায় হাস্যকর ও অবাস্তব হয়ে ওঠে। এ গানের ভাষা ও যেন এই নোংরা বাস্তবকে চিহ্নিত করার জন্যই নোংরা ও বাস্তব হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। নচিকেতার প্রায় সব গানেই এই বেকার রাগী যুবক সমাজ - সমালোচক হিসেবে ফিরে ফিরে আসে। প্রেমিকা থেকে সরক ার - সবাই তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এই তথাকথিত পবিত্র পৌষ নিয়ে আমার একটা সমস্যা আছে। এক ধরনের সহজ বাজার মাৎ করার পদ্ধতি ছাড়াও এই ভূমিকা অনেক সময়ই নারী বিদ্বেষী হয়ে ওঠে বলে আমার মনে হয়েছিল। অথচ নচিকেতার ভক্তদের এক বিশাল সংখ্যাই তরুণী। সব অনুষ্ঠানে দেখতাম তাদের সেকি উন্মাদনা, মাতামাতি। ভাবতাম কেন ? নচিকেতার অনুষ্ঠানের শ্রোতাদের আমি যে লিখিত প্রশ্নপত্র দিয়েছিলাম তাতেও এ বিষয়ে বেশ কিছু মতামত পাই।

১. নচিকেতার অনেক গানেই মেয়েরা করুণার পাত্রী হিসেবে আসে। (পুরুষ, ৩৮)

২. নচিকেতা মেয়েদের আঘাত করেন। হয়তো মেয়েরাই তার কারণ। আজকাল সবই তো ইট্স্ এ গেম্
(নচিকেতার একটি গান আছে প্রেম - ইট্স্ এ গেম্) তাও ভালোও তো আছে। নইলে পৃথিবী টিকতো না। নচিকেতার বোঝা উচিত খারাপ আছে বলেই তো ভালোকে চেনা যায়। আর এও তো সত্য নয় যে পুরুষরা সব বিষয়েই ঠিক। (মেয়ে, ১৮) উত্তর কলকাতার ২০ বছর বয়সের এক কলেজ ছাত্রীর লেখা পড়ে আমি চমকে যাই। তিনি স্বীকার করেন যে নচিকেতা শুধুই পুযদের অনভূতি নিয়ে লেখেন। ছেলেদের প্রেম নিয়ে গান আছে। মেয়েদের প্রেম নিয়ে গান নেই । শেষে তিনি লেখেন সব চেয়ে বড় সাহস হল সত্যি কথা বলার সাহস... নচিকেতার গানে ও অনুষ্ঠানে এই সাহস আমরা দেখতে পাই। নচিকেতার গানের কথা তাঁর গান শুনতে আমাদের বাধ্য করে। তাঁর সুর আমাদের মনে গেঁথে যায়। এই গানগুলোতে অ ামরা আজকের রাজনীতির নেংরা চেহারা দেখতে পাই, সরকারী ডিগ্রির ব্যর্থতা, প্রেমে হেরে যাওয়ার দুঃখ, এবং আই ডোন্ট কেয়ার ভাব টের পাই... এই গানে আছে বৃদ্ধদের জন্য সমবেদনা, আছে কলকাতা, আর আছি আমরা, আমাদের পিটুইটারি গ্ল্যান্ডআমাদের নচিদার গান ভালোবাসতে শিখিয়েছে।(ছাত্রী, ২০) কলকাতার গান ও সংস্কৃতির ইতিহাস

এবং পরিমণ্ডল বিচারে গান ভালোলাগার ক্ষেত্রে একটা শারীরিক, প্রায় যৌন প্রক্রিয়ায় কথা ভাবা এবং বলা, বিশেষত একজন ছাত্রীর পক্ষে, বেশ দুঃসাহসিক বলেই মনে হয়। এই উক্তি আবার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে মানুষ তার নিজস্ব প্রয়োজনে কোনো সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতাকে কী ভাবে ব্যবহার করে তাই নিয়ে শেষ কথা বলতে যাওয়া সমালোচকদের পক্ষে ধৃষ্টতা। একটি মেয়ে এখানে নচিকেতার গানের পৌরুষের বৃত্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে তার রাগ, ক্ষোভ, প্রতিবাদকে নিজের করে নিচ্ছে। অসহায় শিকার তো নয়ই, এখানে সে একজন সাগ্রহী ভোক্তা।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলা গানের ইতিহাসের বহু খ্যাতনামা গায়িকাকে আমরা পেলেও একজনও প্রায় মহিলা গীতিকার খুঁজে পাওয়া যায় না। নববইয়ের দশকে বাংলা গানে দু-একজন মহিলা নিজেদের গানে সুর দিয়ে গাইতে শুরু করেন। মৌসুমী ভৌমিক এঁদের এক জন। বিক্রির বিচারে সে ভাবে জনপ্রিয় না হলেও মহিলা শিল্পী হওয়া ছাড়াও নিজস্ব শৈলীর জন্য মৌসুমীর একটা পরিচিতি ঘটে। বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে এক সময় ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকা এই শিল্পী বিভিন্ন সময়ে এবং আমাকেও সাক্ষাৎকারে কী ভাবে মহিলা হিসেবে বাঁচা এবং মাতৃত্ব তাঁর গানের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। বর্তমান বিশ্বের সত্তা-র ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে স্টুয়ার্ট হল দেখিয়েছেন যে ১৯৬০-৭০ এর দশকগুলোতে নতুন নতুন সামাজিক আন্দোলন কী ভাবে আত্মপরিচয় ও সত্তার ধারণা গুলোকে বদলেদেয়। এই আন্দোলনগুলোর ফলে অন্দর ও বাহির, ব্যক্তিগত ও সার্বজনীন সম্পর্কে আমাদের চিন্তাভাবনার আমূল পরিবর্তন ঘটে। নারীবাদ স্লোগান তোলে যা ব্যক্তিগত তা রাজনৈতিক। এর ফলে ব্যক্তিগত জীবন, বিশেষ করে পরিবার, সমাজের গণ্ডীতে মেয়েদের অবস্থান -- পরিবার, যৌনতা, ঘরের কাজ, লিঙ্গগত বৈষম্য ঘরের কাজে শ্রম বিভাজনে লিঙ্গের ভূমিকা, শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সব কিছুকেই বৃহত্তর সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থানের সঙ্গে যুক্ত এব গুত্বপূর্ণ হিসেবে আমরা দেখতে বাধ্যহই। (৬) একজন সচেতন নারীবাদী শিল্পী হিসেবে মৌসুমীর গানে এই রাজনীতির গভীর ছাপ আমরা দেখি। আমাকে এক সাক্ষাৎকারে মৌসুমী বলেন, যখন আমি গান লিখি চোখেও পড়ে বেশি... কোনো মেয়ে যখন রাস্তায় কাপড় বদলাতে বাধ্য হয় তার অস্বস্তি আমি দেখি (এই নিয়ে তাঁর গানও আছে।) আমি মা, আমার একটা ভুমিকা আছে, সেই সম্পর্কও আমার গানে আসে। আমার ছেলেও আসে... অর্থাৎ মহিলা হিসেবে তাঁর সামাজিক ভূমিকা তাঁর গানে উপস্থিত থাকে। কিন্তু মৌসুমীর গানে আরেকটা বিষয় বা উপস্থাপনার আরেকটা ধরন থাকে যা নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয় না বলে আম ার বিশ্বাস। সেটা হল যা রাজনৈতিক তা ব্যক্তিগত। আমি যেটা বলতে চাইছি তা হল যা ব্যক্তিগত বলে আমরা ভাবতাম তা যে রাজনৈতিক সেই বোধ আজ অনেকেই মেনে নিয়েছি। পাশাপাশি যেটা মানা বা বোঝা প্রয়োজন সেটা হল রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী অনেক মানুষের কাছে আজকের অভিজ্ঞতা ব্যক্তিগত সংকট হয়ে ওঠে। দুটোকে আলাদা করা যায় না। মৌসুমীর বহু গানে এই পথ খোঁজা বা খুঁজে না পাওয়ার সংকট ব্যক্তিগত সংকট হিসেবে ফুটে ওঠে। কখনও আমরা দেখি তিনি অনন্যর খোঁজে বেরিয়েছেন। আবার কখনও নিজেরই ঘুমন্ত শিশুর মুখ চিনতে পারছেন না। সে মুখে যেন কার ছায়া যে ছায়া আজ বড়ই অপরিচিত। এই সংকট যেন এক বামপন্থী স্বপ্নের, এক বিশ্বাসী কাহিনীর সংকট। এই গানে গল্পের পক্ষিরাজ তাই বাস্তবে এক খোঁড়া টাট্টু হয়ে দাঁড়ায়।

নববইয়ের দশকের বাংলা গানের আলোচনা সুমনের গানের আলোচনা ছাড়া সম্পূর্ণ হয়না।
আবার তাঁর গানের এমন বিশাল ব্যাপ্তি যে সংক্ষিপ্ত পরিসরে সে আলোচনা করা কঠিন। নতুন বাংলা গানে সুমনের ভূমিকার একটা মূল গুরুত্ব আলোচনা করে আমি শেষ করব। সুমন একজন সেই ধরনের শিল্পী যিনি গান লেখা এবং গান করা ছাড়াও গান নিয়ে বহু আলোচনা করেছেন, দুঃখের বিষয় তাঁর অধিকাংশ কথাবার্তাকেই আমরা স্পর্ধিত উক্তি বলে চটে যাওয়া ছাড়া বিশেষ ব্যাখ্যার চেষ্টা করি নি। গানের বাইরের কথাবার্তাকে ব্যবহার করে তাঁর গানের মূল্যকে ছোটকরার চেষ্টাও হয়েছে প্রচুর। সুমনের গান এবং নববইয়ের বাংলা গানকে নিয়ে বাঙালীর প্রথম ও প্রধান দুশ্চিন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল গানগুলো টিকবে কিনা। বছর দশেক বাদে নতুন গানের স্রোত অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে এটা ঠিক। বিরোধীরা তাই বলেছিলাম না জাতীয় উল্লাসে উল্লসিত। কিন্তু নববইয়ের গান ফুরিয়ে গেলে আমরা কি রিমেকে ফিরে যাব ? তা কি একটা সংস্কৃতির সৃজনশীলতার তাজমহল ? ইদানীং ভূমি, চন্দ্রবিন্দু ইত্যাদি দু-একটি ব্যাণ্ডের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। চন্দ্রবিন্দু সরাসরি সুমনের কাছে বাংলা গানের নতুন হাওয়ার ঋণ স্বীকার করেন। ভবিষ্যৎ এই মুহূর্তে স্পষ্ট নয়। তবে সুমনের কাছে বাংলা গানের ঋণ বোধ হয় স্বীকার করে নেওয়া ভালো। আশির দশকে বাংলাগান আমাদের আধুনিক গানের চমকপ্রদ ঐতিহ্যের এক অতি তরলীকৃত ভার্সান - এর ওপর দাঁড়িয়েছিল। সুরে - কথায় - মননে তাতে অন্তত একটা প্রচণ্ড ধাক্কা মারেন। সেই ধাক্কার পরে কী উঠে আসবে সেটা কোনো একক শিল্পীর পক্ষে ভবিষ্যৎবাণী করা সম্ভব নয়। সেটা একটা গোষ্ঠীর সামগ্রিক সাংস্কৃতিক পুঁজি এবং একটি বিশেষ শিল্পরূপে অর্জিত দক্ষতার ওপর নির্ভরশীল। হয়তো বাংলা গান তেমন এগোয় নি। তবু ফেলে আসা শতাব্দী ও সহস্রাব্দের শেষ দশকে আমরা আত্মচেতনা বা সত্তার কিছু আধুনিক মূল্যায়নে সমৃদ্ধ হয়েছিলাম--
আমাকে না। আমার আপোস কিনছো তুমি / বল কে জিতল তবে জন্মভূমি ?
সুমনের বহু গানে এক সত্তার পরিচয় পাওয়া যায় যা বহুমাত্রিক। যে নিজের আপোসের কথা জানে। বাজার সম্পর্কে যার কোনো মোহ নেই আবার টেলিগ্রাফের তারেয় বসা ফিঙের ন্যাজে আর চালে ডালে পেঁয়াজে ভরসা রাখতে যে উদ্যমী। যে জাতিস্মরের মতো বার বার ফিরে আসে। পৃথিবীর কটা দেশের কোন গানে এত সমৃদ্ধ উচ্চারণ আমরা পাই ? তার চেয়ে নববইয়ের দশকের পাওয়া - না - পাওয়ার রঙ নিয়ে আরো আলোচনা আরও ভাবনা হোক না। এ পথেই হয় তো আগামীর রঙে ছোপানো হবে আমাদের গান, আমাদের প্রাণ।

টীকা

১. এই বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্য দেখুন Banerjee, S. 1998. The Parlour and the Streets : Elite and Popular Culture in Nineteenth Century Calcutta, Calcutta, Seagull Books,   বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত, ১৯৮৬ বাইনাচ বনাম খেমটা-উনিশ শতকের বাংলা সংস্কৃতি শ্রেণী নববই দশকের বাংলা গান বৈষম্য, শারদীয়া বারোমাস, পৃ ১৬-৩২ এবং ঐ লেখকেরই প্রাঙ্গন বিহারিনী রসবতী উনিশ শতকের কলকাতার লোক সংস্কৃতিতে মহিলা শিল্পী, অনুষ্টুপ ২১ বর্ষ, সংখ্যা ১, প ১০০- ১২৭।

২. তৎকালীন কলকাতার গানের বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মতামতের আলোচনার জন্য দেখুন, চত্রবর্তী শ্যামলী, ১৯৮৭, বঙ্কিমের গানের জগৎ, বারোমাস। এপ্রিল, পৃ ১১ - ৪৩।

৩. নচিকেতা, ১৯৯৬, সানন্দা পার্বনী সংখ্যা পৃ ১৮১ - ১৮৮

৪. এই বিষয়ে আলোচনার জন্য দেখুন ADORNO T.W এবং HOKK HEIMER, M, 1973 “The Culture Industry : Enlightement as Mass Deception”, S. During সম্পাদিত ‘The Cultural Studies Reader’, London, Routledge, 29-43.

৫. Hall. S. 1993, “Encoding and Decoding” S. During সম্পাদিত, “The Cultural Studies Reader’, London, Routledge. 90 – 103.

৬. Hall, S. 1992 “The Question of Cultural Identity”, D. Held ও অন্যান্য সম্পাদিত ‘Modernity and Its Future’, Cambridge Polity Press - Open University, 273 – 326.